সুশীল জানার ‘আম্মা’ ও ‘সখা’ ঃ এক প্রতিবাদী চেতনা

বিজিত ঘোষ

সুশীল জানার জন্ম মেদিনীপুর জেলায়, ১৯১৬-তে। লেখালিখি করছেন দীর্ঘকাল ধরে। নিছক শখের জন্য লেখালিখি নয়। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পী তিনি। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ত্রমাগত লিখে চলেছেন। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে সুশীল জানার নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে।

তাঁর উপন্যাস- ছোটগল্পের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে গ্রামবাংলা অনেকখানি জায়গা পেয়েছে। আসলে গ্রানের মানুষের প্রতি তাঁর নিবিড় টান। নাড়ীর যোগ বলা যেতে পারে।

বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবন ও তাদের সংগ্রাম তাঁর বহু লেখাকে বিশেষ উজ্জ্বলতা দিয়েছে। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার, শুধুমাত্র অস্তিত্বটুকুই টিকিয়ে রাখার সমস্যা, জটিলতা; এককথায় তাঁদের সহস্র জীবনকে আতিপাতি করে দেখতে চেয়েছেন সুশীল জানা। সাধারণ মানুষের প্রেম, দুঃখ, সুখ-সংগ্রাম; আর সংগ্রাম উত্তীর্ণ নতুন জাবনের স্বপ্ন নিয়ে, আজও তিনি লিখে চলেছেন।

তাই ৮২ বছরের বৃদ্ধেরও গ্রন্থ এখন যন্ত্রস্থ। ছাপা চলছে দুটি উপন্যাস। একটি ‘সাগরসঙ্গমে’। আর একটির নাম এই মুহূর্তে তিনি মনে করে বলতে পারলেন না।

তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ‘শতদ্রুর সন্ধ্যা’, ‘গল্পময় ভারত’, ‘বাঘের দুধ’, ‘বাঙলা প্রবন্ধ ও ভাষা শিল্প’, ‘বেলাভূমির গান’, ‘শৃঙ্খল ঝঙ্কার’, ‘সূর্যগ্রাম’, ‘পদচিহ্’, ‘শেওলা’, ‘ঘরের ঠিকানা’, ‘গ্রামনগর’, ‘নগরপ্রান্তরে’, প্রভৃতি।

‘শতদ্রুর সন্ধ্যা’ উপন্যাসটি বঙ্কিম পুরস্কারে সম্মানিত। আর তাঁর ‘আম্মা’ গল্পটি বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার গৌতম ঘোষের পরিচালনায় ‘দখল’ নামে স্বর্ণকমল সম্মানে ভূষিত। ‘আম্মা’ প্রথম ‘দেশ’ -এ প্রকাশের পরই পাঠক মহলে বিশেষ সাড়া ফেলেছিল।

গরিবের গরিব, দরিদ্রের দরিদ্র, ভিখিরির ভিখিরি যাযাবল বৃত্তির ‘কাকমারা বেদিনী’ ; সর্বোপরি এই শ্রেণীর অন্ত্যজদের দায়িত্ব ইংরেজ সরকার বা সিরাজ পরবর্তী নবাবগণও গ্রহণ করেনি কখনো। যাযাবরী বৃত্তির কাউকে ভ্রাম্যমান জীবন থেকে তুলে এনে ঘর, জমি, স্বামী, সন্তান দিলে সে- ও স্থিতু হতে চায়। হাজারো চত্রান্তও তখন আর তাকে সেই নতুন স্থিতু জীবন থেকে সরাতে টলাতে পারে না। এই ব্যাপারটাই বলতে চেয়েছেন সুশীল জানা তাঁর ‘আম্মা’ গল্পে।

এটি একটি চাষি- বউয়ের জমিদার-তহশিলদারের শোষণের বিদ্ধে গর্জে ওঠা প্রতিবাদের কাহিনী। কেবল প্রতিবাদই নয়, এটি একটি শ্রেণীর প্রতিরোধের কাহিনীও হয়ে উঠেছে।

‘কাকমারা’ দলের মেয়ে আন্দিকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল জগাচাষি। ‘চাষির রক্তে আছে ঘরের টান, মাটির টান। তাই ধীরে ধীরে ‘কাকমারা বেদিনীর মধ্যে গজিয়েছে শেকড়। দুই জাতির রক্তের চমৎকার সহাবস্থান ঘটেছে আন্দির মধ্যে। ‘বেদের মেয়ের নির্ভীকতার সঙ্গে মিসেছে কিষাণ বউয়ের লক্ষ্মীশ্রী। জগার সঙ্গে ঘর বেঁধে ‘বানভাসি বেদেনীর লাগল নতুন নেশা- জমির নেশা, ঘরের নেশা। স্বামীর সঙ্গে মিলে যতটা পারলে আবাদ করলে দুহাতে।

সেই আবাদ জমি, ভিটে-বাড়ি আজ সব অন্যায়ভাবে দখল নিতে যায় গ্রামের জমিদার। গ্রামের জমিদারের হয়ে গোবিন্দ তহশিলদার আন্দির জমি-বাড়ি কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। তাদের সাহস হয়, তিনটি নাবালক পুত্রের জননী বিধবা আন্দি একা বলে। যদিও আন্দির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল মাগন মন্ডল। কিন্তু নির্ভীক, ভয়ংকর সাহসী বলিষ্ঠদৃঢ়চিত্ত, প্রতিবাদী আন্দির ঔজ্জ্বল্যের পাসে মাগন নিতান্তই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। মাগন-আন্দির কথোপকথনের মধ্যে উভয়ের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য যেমন প্রকাশিত, তোমনি শোষক চরিত্রের শোষণের, ষড়যন্ত্রের চিত্রটিও অস্পষ্ট থাকে না।

‘.....শালা তশীলদার জরিপ সাহেবকে একেবারে হাত করে ফেলেছে, মায় আমিন পর্যন্ত। জগার সব জমি মায় ভিটে পর্যন্ত খাস গেল জমিদারর নামে। জগার কোন ওয়ারিশ নাই—এই কথা জেনে নিল জরিপ্-সাহেব।

এ শালা সেই গোবিন্দ তশীলদারের কারসাজি ।

যা যা ঘটেছে আন্দির সামনে তার অনুপুঙ্খ চিত্র, শান্ত, নিরীহভাবে তুলে ধরে মাগন । তা শুনে ক্রোধে জ্বলে ওঠে আন্দি । দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'এই তিন-তিনটা ব্যাটা, তার বাপের কেউ নয়, এই কথাটাই-সত্য বলে দাগা হয়ে যাবে সরকারী কাগজে, রাগে আন্দি গর্‌গর্‌ করে । 'জ্বলে ওঠে', বলে ঃ 'ভিটে ছাড়া করবে বলে তশীলদার হুমকী দেখায় মোকে, কেড়ে নেবে মোর ব্যাটার হক পাওনার জমি ।'

তিনদিন পর হাকিম ডেকে পাঠায় আন্দিকে । মাগন হাকিমের কচে পরিচয় দেয় আন্দির ঃ 'এই হলো জগার বউ হুজুর ।' গোবিন্দ খেঁকিয়ে ওঠে বাধা দেয় ঃ 'বউ না আর কিছু, জগার রক্ষিতা হুজুর ।' জগার সঙ্গে বিয়ে সাদি বিষয়ে হাকিম প্রশ্ন করে আন্দিকে । আন্দি উত্তর দেওয়ার পূর্বেই গোবিন্দ ব্যঙ্গের সুরে বলে ঃ 'কাকমারা মাগীর সঙ্গে সচ্চাষীর বিয়ে সাদি হুজুর !'

আন্দি এইসব সাজানো মিথ্যে ব্যাপারস্যাপার দেখে একেবারে থ । গোবিন্দ ক্রমাগত হাকিমের কাছে আন্দির চরিত্র নিয়ে কুৎসিত, অশ্লীল কথাবার্তা বলতে থাকে । 'এরকম আকছার হয় হুজুর । উদো চাষাভুষো যেমন ফাঁদে পড়ে তেমন ও মাগীরাও একটা থেকে আর একটার কাঁধে চাপে । সব বেশ্যার শামিল ।' আন্দির সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গোবিন্দ । চিৎকার করে উঠে আন্দি ঃ 'কি বললি হারামের ব্যাটা -আমি বেশ্যা ।' এ-কথার প্রমাণ দিতে শোষক, নীতিহীন গোবিন্দ আগে ভাগেই টাকা দিয়ে এক মিথ্যে সাক্ষী সাজিয়ে রেখেছিল । সেই ভাড়াটে সাক্ষী হারাধন, আন্দির সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের কথা বলে ।

আর তো সহ্য হয় না । আন্দির 'ঘাবড়ে যাওয়া ফ্যাকাশে মুখে ফিরে এসেছে ওর যৌবনের বলিষ্ঠ উচ্ছ্বাস, ওর গভীর কালো চোখে ঝিকিয়ে উঠেছে সেই বেপরোয়া বেদিনী । কোলের ছেলেটাকে নামিয়ে রেখে একটা বাঘিনীর মতো ছুটে গেল সে। হারাধনের দিকে, এক লহমায় গিয়ে চেপে ধরল তার গলা ঃ 'হারামির বাচ্ছা !'

হারাধনকে ছেড়ে গর্জে উঠে আন্দি ছুটে গোবিন্দের দিকে ঃ 'তোকে মেরে ফেলাব ..... মেরে ফেলাব হারামি !'

কুৎসিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আন্দির চরিত্র হননে, সর্বোপরি অন্যায়ভাবে তাকে বঞ্চনা করায় ভেতরে ভেতরে ভীত হয়েইছিল গোবিন্দ । তাতে আন্দির এই ভয়ংকরী প্রতিবাদী মারমুখী রূপ ..... গোবিন্দকে সন্ত্রস্ত করে তোলে । গোবিন্দ প্রাণভয়ে লাফিয়ে হাকিমের পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে ঃ 'দেখুন হুজুর-- ছোটজাতের স্বভাব । বেদিনী হারামজাদী সাক্ষাৎ চামুন্ডা হুজুর ।'

জবাব দেয় আন্দি ঃ 'তোর ভদ্দরলোকের মুখে মারি লাথি ।' এখানে কে ভদ্র আর কে অভদ্র তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট । তাই গোবিন্দরূপী অসভ্য-ইতর-নেংরা ব্যক্তি যদি এক সৎ সংগ্রামী নারীকে ছোটজাত বলে, তার প্রত্যুত্তরে 'ভদ্দরলোক' বানানের মধ্যবর্তী ব্যঙ্গ-শ্লেষই যথেষ্ট । এই বানান মানিক তাঁর গল্প- উপন্যাসের একাধিক স্থানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার চূড়ান্ত সার্থকতা দেখিয়েছেন । আর গোবিন্দর আন্দিকে 'সাক্ষাৎ চামুন্ডা' মনে হওয়াও বিশেষ অর্থবহ বলে আমাদের বোধ হয় । গেবিন্দরূপী অসুরদের বধ করতে সাক্ষাৎ চামুন্ডাই নানা বেশে নানা কালে যথা সময়ে মর্ত্যে আবির্ভূতা হন ।

ওদিকে গোবিন্দের ভাড়াটে গুন্ডারা আন্দির ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় । 'চাষীর কুঁড়ে', পুড়ে শেষ হতে আর কতক্ষণই বা লাগে ।' কিন্তু আন্দি তার লড়াইয়ের মাঠ থেকে আর এক ইঞ্চিও সরতে রাজি নয় । কেবল প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধের সংকল্পে অটল আন্দি । তাই 'সেই ছাইভস্মের পাশে তিনটে ছেলেকে নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল আন্দি ।' এই 'খাড়া দাঁড়িয়ে' থাকা আন্দি তার অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প । বিদ্ধ শোষক গোষ্ঠীর ভাড়াটে গুন্ডাদের ছোঁড়া ইঁটে মেজ ছেলেটার কপাল ফাটে । তবু নির্ভীক আন্দি আনড়। অটল । আপন সংকল্পে ছেলেটার কপালের রক্তধারার দিকে চেয়ে চেয়ে ঝকমক করে উঠল আন্দির 'পাথর-কালো চোখদুটো ।'

মাগন তাকে পালিয়ে আসতে বলে । পালিয়ে যাবে আন্দি ? সে ধাতুতে গড়া নয় আন্দি । কেন যাব ?' দাঁতে দাঁত চিবিয়ে আন্দি বললে, 'কোথায় যাব মোরা ব্যাটাদের ভিটে ছেড়ে ? ওদের মতো জন্ম দিইনি মোরা ও চরের ।' আন্দি তখনও ফুঁসছে ঃ 'এসে তাড়াক মোকে গিধ্‌ধোড়ের বাচ্চারা ।' সে কিছুতেই ভুলতে বারে না তার স্বামীর আমানুষিক পরিশ্রমে তৈরি এই জমি, ভিটার কথা । তাই বিড়বিড় করে আবার আন্দি বলে ঃ 'মোর মরদের ভিটে, মোর ব্যাটার ভিটে !"

আন্দির এই অভিমান, দাবি বোঝে মাগন । তাই সে আন্দিকে বোঝায়, সে একা নয়, অনেকেই আছে তার সঙ্গে । 'হ্যাঁ হ্যাঁ এ তোর ব্যাটারই ভিটে । ..... এ চরের চাষীরা তা সবাই জানে । তারা বলছে তোর ব্যাটার জমিই তার চষে আবাদ করবে । এই পোড়া ভিটেয় আবার ঘর তুলে দেবে । কেউ তাড়াত পারবে না তোর ব্যাটাদের । ও হাজার লেখা হোক কাগজে কলমে । সবাই বসে আছ মোর দাওয়ায় । চল নিজে শুধোবি । এখন চল তুই এখেন থেকে-- হাতে ধরে বলছি তোর, হেথা থেকে সরে যা ।'

অন্ধকার থেকে আবার একটা ঢিল এসে পড়ে । এবার তা এসে লাগে আন্দির গায়ে । মাগন আবার আন্দিকে চলে আসতে বলে । আন্দির মুখ দিয়ে উচ্চারিত ছোট একটি অক্ষর আমাদের বুঝিয়ে দেয় তার চারিত্রিক দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, নিজের অধিকার বুঝে নিতে চাওয়া এক অনন্যা- একাকিনী, সাহসিকা মহিলাকে । আন্দি কেবল একটা অক্ষরে উচ্চারণ করে ..... 'না' ।

সুশীল জানার গল্পের চরিত্রগুলি উঠে এসেছে মাটি থেকে । পাতাল জীবনের আন্ধকার ঘিরে আছে নায়িকা আন্দিকে, কিন্তু তার দুর্বার জীবন শক্তির প্রতিরোধ-সংকল্প তার মুখে ফেলেছে আশার আলো । যাযাবর বংশের মেয়ে আন্দি ঘর বেঁধেছিল সৎ চাষির ছেলে জগার সঙ্গে, মাটির টানে গার্হস্থ্য জীবনের স্থিরতায় বাঁধা পড়েছিল । জগার মৃত্যুর পর আন্দি কীভাবে জমিদার নায়েবের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে মহিমময়ী মাতৃ-মূর্তিতে দেখা দিল , তারই আশ্চর্য কাহিনী সুশীল জান

ার 'আম্মা' । কোনো ভাষাতিশয্যের কুয়াশায় সে ঢাকা পড়েনি । সমস্ত রূঢ়তা, স্থূলতা, নীচু স্তরের অশালীনতা ও অপরিচ্ছন্নতা নিয়েই এই মানবিক মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে । গল্পের শেষটি প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, সংগ্রামে, সংকল্পে চিরকালের একটি উজ্জ্বল চিত্র হয়ে আছে ঃ 'হঠাৎ ফেটে পড়া একটা সবল কণ্ঠ নিস্তরঙ্গ মরা অন্ধকারকে যেন আলোড়িত কম্পিত করে তোলে মুহূর্তে, 'আসুক কে লড়বে মোকে ।'

তিনটে ছেলেকে ঘিরে অটল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল আন্দি । নড়ল না এক পাও । 'একটা রাঙা আভা ঝলমল করছে অন্ধকারে -- সেটা যেন নিভন্ত খড়কুটোর নয়, সে ওই বাঘিনী মেয়েটার রাঙা চোখের আগুন, ওর সর্বাঙ্গের ত্রুদ্ধ দ্যুতি ।'

।। সখা ।। বন্‌শী মাঝির নেতৃত্ব জমিদার, মালিকদের ত্রমাগত শোষণের বিদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে শু করে নিপীড়ন আদিবাসী মানুষগুলো ।

ব্‌নশী মাঝি পুলিশের গুলি খেয়ে মংলার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল । মংলার সেবা-যত্নে সুখ হয় বংশী । অসুস্থ অবস্থাতেই মংলার গৃহে চুপিচুপি সে সংগঠনের কাজ করে । নিপীড়িত, শোষিত আদিবাসীদের সংঘবদ্ধ করে । তাদের সঙ্গে আলোচনা করে । 'সোদা, শিয়াশাল, শালবোনি, পিয়ারাডোবা, কালি পাথরি, চন্দ্রকোনা জমায়েত হলো এসে একে একে । এমনি হয়ে এক একদিন । বিরাট এক পাহাড়ী জংগলের কিনারা ঘিরে আদিবাসী এলাকা লাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত, দরিদ্র । গর্‌গর্‌ করছে অারণ্যক জীবন আগুন জ্বলে ওঠার আগে গুমরে মরা ধোঁয়ার মত । সেই অসন্তুষ্ট ঘৃণাবেগ ধোঁয়ার তালে যেন ঘর ভরে যায় মংলার । সেদিন অনেক কী সব শলাপরামর্শ করে ওরা চলে গেল একে একে রাত যখন গভীর হলো ।'

শুধু বন্‌শীই নয়, তার প্রকৃত সখা মংলাও নেমেছে বিশাল কর্মপ্রাঙ্গণে । শোষিত আদিবাসীদের সংঘবদ্ধ করতে বন্‌শীকে সহায়তা করে মংলাও একান্ত নীরবে । তাই বন্‌শীর সঙ্গে সঙ্গে মংলার প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা জাগে । বন্‌শী মংলাকে বলে ঃ 'তুমিই হলে মোর খাঁটি সয়া । মুখ ফুটে বলতে হয় না কিছু । প্রাণের কথা আপনি বুঝে নাও !.....সয়া ? এত কান্ড করছো তলায় তলায় বলোনি মোকে একদিনও ।'

নীববে, গোপনে, শেষিত মানুষের স্বার্থে বন্‌শীর বিপ্লবের পথকে ত্বরান্বিত, মসৃণ করে তোলে মাত্র ১৯-২০ বছরের এই সাঁওতাল মেয়েটা । একান্ত নিভৃতে কতো বড়ো কাজ সে করেছ, তা বন্‌শী-মংলার টুকরো টুকরো সংলাপে আমরা টের পেয়ে যাই । আমাদের সম্ভ্রম আদায় করে নেয় মংলা । শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে আসে এই ছোট্ট মেয়েটির পরিণত বিপ্লব ভাবনায় ।

''..... এর মধ্যে একদিন চন্দ্রকোনা গেছলে ?''
''গেছলাম মাঝি !''
''সেখানে বলে এসেছ ও গাঁয়ের তোমরাও যাবে জংগলে দখল নিতে ?''
''হ্যাঁ মাঝি !''
''এর মধ্যে কবে ঘাস কাটার মজুরি বাড়ানোর জন্যে দু'দিন কাজ বন্ধ করেছিলে নাকি ?''
''করেছিলাম মাঝি !''
''সবাই তোমার কথা শোনে ?''
''কথাটা যে সকলের মাঝি ।।''

প্রতিবাদের, প্রতিরোধের, বিপ্লবের মূল কথাটিই শোনা যায় মংলার মুখে । শোষিত শ্রেণীর স্বার্থে ককলকে নিয়ে সংগ্রামে নামতে পারলেই তো জয় সুনিশ্চিত । গ্রামে গ্রামে তাদের নেতা বন্‌শীর কথা বলে এসেছে সববাইকে । 'আর বলেছি..... চিরকাল কি সে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবে.... দিনের আলোর মুখ কি দেখবে নি ?''

মংলার মুখের দিকে এক দৃষ্টি চেয়ে থাকে বন্‌শী মাঝি । 'অন্ধকারেও সে উদ্দীপ্ত আবেগ ঢাকা পড়ে না । সেই স্ফুরিত আবেগ কেঁপে উঠতে শুনলো তার গলায়, ঝলকে উঠতে দেখলো তার চোখে । এই মেয়েটা কোথায় কোন গাঁয়ে গাঁয়ে বস্তিতে ঘুরে বেড়িয়েছে একা, গেছে চন্দ্রকোনার মাতব্বরদের কাছে লুকিয়ে, একজোট করেছে তাদের মেয়ে মরদকে, অথচ কিছুই জানায়নি তাকে । মেয়েটাকে হঠাৎ মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে করে বন্‌শীর ।'

বন্‌শী আস্ত করে মংলাকে । বলে, '.....অন্ধকার চিরদিন থাকবে নি সয়া, সবাই মোরা আলোর মুখ দেখবো ।' সংঘবদ্ধ প্রতিবাদে, প্রতিরোধে সোষিত জনতা একদিনসোষণের অন্ধকার কক্ষ থেকে শোষণমুক্ত পৃথিবীর আলোতে ফিরে আসবেই । শুধু চাই একতা । নিপীড়িত শ্রেণীর সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ প্রতিরোধের বানে শোষকশ্রেণী একদিন ভেসে যাবেই । একত্রে থাকার শক্তি, জোর কতখানি তা গুলিবিদ্ধ পায়ে গভীর ক্ষত নিয়ে বন্‌সীর আবেগময় সংলাপে স্পষ্ট রূপ পায় ঃ 'সকলের মুখে তোমার কথা শুনে লাঠির কথা ভুলে গেলাম সয়া । মনে হলো লাফ দিয়ে আজ ছুটে যেতে পারি' ।

নিপীড়িত, অসহায়, সৎ, আদিবাসী সাঁওতালরা আর কতদিন মুখ বুঁজে অন্যায়, অবিচার শোষণ সহ্য করবে ? বন্‌শী তাই বলে, চুপ ত অনেকদিনই করেছিলাম .... বাপঠাকুরদাদা পাথরের চাঙা কেটে কেটে ধানের জনি করেছিল, সেখানে মোরা আজ উটবন্দী চাষি । .... বনের লোক মোরা বনে ছিলাম । কাঠ কাটতাম, ফুল পাড়তাম মহুয়ার, খেতাম তাই বেচে । তাও কেড়ে কুড়ে ব্যবসা করছে খোট্টা জমিদার । গোচরডাহীতে গো, মোষ চরাতাম..... তাও কেড়ে লিয়ে বাবুই ঘাসের চাষ করলো কাগজ কলের মালিক ; আর পাশে খুলে দিল গো খোঁয়াড় । গো ধরে ধরে সব নিলাম করে দিলে । হয়ে গেল গরিব বাপ ঠাকুরদাদা । আর কত চুপ করে থাকবো বল সয়া ?

মানুষের একটা সহ্যের সীমা থাকে । একদিন সে সীমা অতিক্রম করে নিপীড়িত জনতা জেগে ওঠে । ঘুরে দাঁড়ায় । লেখক সেই সত্যকেই তুলে ধরছেন তার প্রতিবাদী মানসিকতায় ঃ জংগলের মানুষ কথা কয়ে উঠেছে । আশ্চর্য সেই দীপ্তিতে ঝকমক করে ওদের চোখ । শাল মহুয়ার জঙ্গল ঘেঁষে একটা মরা গাঁয়ের কোণ দেখে যেখানে একদিন গা ঢাকা দিতে এসেছিল বন্‌শী দেখতে দেখতে সে জায়গাটা নতুন এক প্রাণস্পর্শে যেন নড়ে চড়ে উঠলো । অরণ্যের লুকানো আগুন ধূম হয়ে উঠতে লাগলো আস্তে আস্তে নিঃশব্দ অসন্তোষের মাঝখানে ।'

সত্যই আগুন জ্বলে উঠলো একদিন । তাই বন্‌শীকে আপাতত গা ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হল মংলাদের । এ যাওয়া পালানো নয় । এ যাওয়া রণে ভঙ্গ নয় । এ যাওয়া গাঁ ত্যাগ করা নয় । দীর্ঘকালীন বিপ্লবের পথে মুহূর্তের একটা কৌশল মাত্র । অথবা, মহাভারতের মূল তত্ত্বের মতো । সর্বশক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশের পূর্বে ক্ষণিকের অজ্ঞাতবাস । যা আসলে প্রস্তুতি-পর্ব । সেই দীর্ঘজীবী বিপ্লবের কথা বলে যায় বন্‌শী ঃ 'যাই তবে সয়া ! দিনের আলোয় দেখতে আসব আবার দিন যেদিন আসবে । আজ পালাচ্ছি অন্ধকারে । ভেবোনি তুমি । আমি জানি সাঙাৎ, ভোর একদিন আসবেই । মোদের জংগল যেদিন ঘুরিয়ে নেবো, জমিন যেদিন মোদের হবে সেদিন কেউ ছেড়ে যাবে নি আর গাঁয়ের মাটি ।'

'দিনের আলো', 'ভোর', শব্দগুলি, ... বিপ্লবের শেষ এখানেই নয়, বরং বিপরীত সত্যকেই ইঙ্গিত করে, লেখকের আশাবাদী বিপ্লবী ভাবনায় ।

মংলা বন্‌শীকে ভালোবেসেছিল । ভালোবেসেছিল বন্‌শীও মংলাকে । তাদের সে ভালোবাসা দুটি মানুষের মিলনে নিঃশেষিত সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক ভালোবাসা নয় । এ এক বৃহত্তর মহত্তর ভালোবাসা যা বিপ্লবের পথকে তরান্বিত করে । তাই বন্‌শী চলে যাওয়ার সময় তার টাঙিটা মংলার কাছেই রেখে যায় ।

'থাক সয়া ওটা তোমার কাছে । তোমার ছেলে হলে তার হাতে দিয়ে বোলো মোর কথা । বোলো মোর সাঙাৎকে ।'

বিপ্লবের মৃত্যু নেই । বিপ্লব দীর্ঘজীবী । বিপ্লবীর মৃত্যু আছে । কিন্তু বিপ্লব মৃত্যুহীন । তা একটা ধারা । তা একটা প্রবাহ । এক হাত থেকে অন্য হাতে, অন্য হাত থেকে আর এক হাতে বয়ে চলে সে প্রবাহ । বন্‌শী যে বিপ্লবের মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, তার প্রবাহ চলবে আবহমান কাল ধরে । বন্‌শী থেকে মংলায় । মংলা থেকে তার পুত্রে । পুত্রের পুত্রে তারও পুত্রে .....চলতেই থাকে ও প্রবাহ ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com